যে কথা বলতে মানা

স্মৃতির দর্পনে

জয়নাল আবেদীন

জীবন চলার পথের এক সর্পিল মোড়ে দাঁড়িয়ে দোদুল্য মনমানসিকতার একটা কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের অভিবাসি জীবনের শুরু সেই ১৯৯০ সনের শেষার্ধ থেকে। স্ত্রী আর ছোট ছোট দুটো ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ১৯৯০ সালের সপ্টেম্বরের এক তারিখে আমরা সিডনী আসি। তারপর থেকে অনেকটা সময় কেটে গেছে। প্রতিটি অভিবাসি জীবনের মতোই এর অনেকটাই ঘটনা বহুল, বেশ কিছু গতানুগতিক-সাধারণ, আর কিছু আছে স্মরণীয়; স্মৃতিতে অম্লাণ। ১৯৯০ থেকে এখন পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে যা কিছু আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল, বিশেষত্বের দাবিদার তা অন্য অনেকের কাছেই হতে পারে সাধারণ, বিশেষত্বহীন, সাদামাটা । সেটাই স্বাভাবিক; প্রাসঙ্গিক কারণেই অভিপ্রেত। আর এখানেই আমরা স্বতন্ত্র; নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা পরিচালিত স্বাধীন ব্যক্তিসত্বা। এই পার্থক্যই আমাদের বৈশিষ্ট্য, একজন স্বতন্ত্র, নির্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিসত্বার গর্ব। এই গর্ব আমার, আপনার, আমাদের সকলের। আমাদের মত থাকবে, মতের পার্থক্য থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। মতের মিল না থাকলে মনের মিল হবে না, ভিন্ন মতাবলম্বী হলে বন্ধুত্ব অসম্ভব; এই মতবাদে আমার বিশ্বাসী নেই।

অভিবাসি জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা কি বললে আমি নির্দিধায় আজ ও যেটা বলি সেটা হলো, স্যার ডোনাল্ড ব্রাডমানের দেয়া টিভি সাক্ষাৎকার। সেটা সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কোন এক দিন। সিডনীতে এসেছি মাত্র কয়েকদিন। পত্রিকা দেখে চাকুরী খোঁজা আর টিভি দেখাই তখন মূলতঃ প্রধাণ কাজ। এর মাঝে হঠাৎ একদিন টিভির পর্দায় ক্রিকেট জগতের কিংবদন্তী নায়ক স্যার ডোনাল্ট ব্রাডম্যান। পত্রিকার পাতায় তাঁর অসংখ্য ছবি, জীবনী আর রেকর্ড দেখে দেখে সে আমার সেই ছেলেবেলার স্বপ্ন নায়ক। আমার চোখের সামনে টিভির পর্দায় তার সরাসরি সাক্ষাৎকার। তাঁর দেশে বসে, সম্ভবতঃ তাঁর খুব কাছ থেকেই তাঁকে দেখছি, যেন অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। তাঁর বলা প্রতিটি শব্দ, বাচনভঙ্গি যেন আক্ষরিক ভাবেই গিলেছি। অনুষ্ঠানে মিসেস জেসি ব্রাডমান ও উপস্থিত ছিলেন এবং পরিপূরক সাক্ষাৎকার দেন। বয়সের চিহ্ন দুজনেরই অবয়বে সুস্পষ্ঠ। কিন্তু কি উদ্ভাসিত, প্রাণবন্ত উপস্থিতি। জীবনের বিস্তির্ণ ক্রিকেট প্রান্তরে একটা দীর্ঘ ও সফল ইনিংশ খেলার পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ঝলমল দুজনেরই চোখমুখ। দুটো পরিপূর্ণ, সফল, সার্থক জীবন। অসংখ্য মানুষের সীমাহীন এই ভালবাসা; একটা মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়ার আর কি থাকতে পারে? স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান আজ আমার এতো কাছের মানুষ, সেদিন মনে হয়েছিল আমার অষ্ট্রেলিয়া আসার সিদ্ধান্ত মনে হয় বেঠিক হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বব হককে তারই ডেপুটি, তার মন্ত্রী সভার ট্রেজারার পল কিটিং যেদিন রাজনৈতিক ভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় যে, আমিই পার্টির ভেতর অধিক জনপ্রিয়, এদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব এখন আমার প্রাপ্য, তখন সবে বাংলাদেশ থেকে আসা মন-মানসিকতায় বিস্মৃত হয়েছি। বলে কি এই লোক! প্রথম বারের প্রচেষ্টায় সফল না হলে ও দ্বিতীয় বার পল বিফল হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে বব হকের চোখে পানি দেখে এটাকে বিশ্বাসের অবমাননা মনে হলেও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার এই বিরল দৃষ্টান্তে সার্বিকভাবেই অভিভূত হয়েছি। গর্বিত হয়েছি মনে মনে, এই সমাজের আজ আমিও একজন; একথা অতি সন্ত পর্ণে হলেও ভাবতে পেরে।

প্রাসঙ্গিক কারণেই মন ছুটে গেছে তাৎক্ষনিক ফেলে আসা প্রিয় বাংলাদেশে। অশিক্ষিত জনগণ গণতন্ত্র উত্তরণের পথে প্রধান অন্তরায়; বিজ্ঞ সুধি সমাজের এ বাণীতে আর একটুও বিশ্বাস নেই। অনেকে কায়দা করে বলেন, বাংলাদেশ গণতন্ত্রের জন্যে এখনও প্রস্তুত হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয়না কথাটার মানে। অশিক্ষিত, দরিদ্র জনগণের প্রতি সবল কটাক্ষ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে বা বাইরে, যেখানে বলতে গেলে সবাই শিক্ষিত সেখানে গণতন্ত্রের চেহারা যে কি তা মোটমুটি সবারই জানা। আর অষ্ট্রেলিয়ায় সব শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত এই বাংলাদেশী কমিউনিটিতে? আমরা সবাই যুক্তি বুঝি, গণতন্ত্র মানি; তব যতক্ষণ তাল গাছটা আমার। অশিক্ষিত একটা দেশের অল্প সংখ্যক শিক্ষিত হওয়ার কারণেই মনে হয় আমাদের আত্মবিশ্বাসটা (অন্য বাঙালীর সাথে তুলনায়) মাত্রাতিরিক্ত বেশী। অন্যের বিশ্বাস, তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রক্রিয়ায় আমরা মোটেই অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ পাইনি । যেকোন আনুষ্ঠানিক কথা-বার্তা, আড্ডা-আলোচনা, সভা-সমিতিতে একটু সচেতন থাকলেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে সাড়ম্বরে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মহান দায়িত্বটা শিক্ষিত লোকের। যেই সর্ষে ভূত তাড়াবে সেই সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা গুরুতর। অগণতান্ত্রিক একটা নেতৃত্ব একটা গণতান্ত্রিক অবকাঠামো তৈরী করবে, গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবে, ব্যাপারটা হাস্যকর। গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে বাংলাদেশে অশিক্ষিত জনগণ নয়, শিক্ষিত জনগণই যে প্রধান অন্তরায় এতে আমার গভীর বিশ্বাস।

বাকস্বাধীনতার উপর ফরাসী ঐতিহাসিক এবং লেখক ভলতেয়ারের একটা উক্তি অনেকের মতোই আমার মনের পর্দায় গভীর ভাবে গেঁথে আছে। তিনি বলেছিলেন, “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.- Voltaire. এমন কথা শুনলে কার না ভাললাগে? পা ছুঁয়ে সালাম করতে ইচ্ছা করে। তবে তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যখন নিজের উপর পড়ে তখন মনে হয় মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলে। পলিন হেনসেন অষ্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক আকাশে একটা দুষ্ট নক্ষত্র। এশিয়ানদের লক্ষ করে অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে দেয়া তার ‘মেডেন স্পিচ’-এ সমস্ত এশিয়াবাসীর সাথে আমিও আতঙ্কিত হয়েছি। সেই সাথে সেদিন গর্ব ও হয়েছিল এই ভেবে, আমি এখন এমন একটা দেশের নাগরিক

যেখানে পলিন হেনসনেরা তার মনের কথা বলতে পারে। আমার নিজের, আমাদের সবার সেই গর্বিত গণতান্ত্রিক অধিকারটা আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর কয়েকজন বন্ধুর সাথে এক বাড়িতে একদিন আড্ডা হচ্ছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই গরম খবর হিসেবে পলিন প্রসঙ্গ এসে গেলো। বক্তাদের সবাই বাকস্বাধীনতার পক্ষেরই লোক, তবে অনেকের মতে সেই স্বাধীনতার মানে এই স্বাধীনতা নয়। এত উস্কে দেয়া; সমাজে গন্ডগোল লাগানো। সরকারের উচিৎ এধরণের উস্কানীমূলক কথাবার্তার একটা সীমারেখা নির্ধারণ করা। বক্তাদের অনেকেরই গলার স্বর উচুতে উঠলো, কারও কারও মুখের রং ও পরিবর্তিত হলো। একটা নতুন আইনের বড়ই প্রয়োজন মনে হলো।

পৃথিবীর সব সুবিধারই কিছু অসুবিধা আছে। বাকস্বাধীনতাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই বলে আইন করে বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের চিন্তা পাগলামী। আশার বিষয় হলো, অষ্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এই পাগলের সংখ্যা এত কম যে খুব একটা ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু বাংলাদেশের পটভূমিতে আনুপাতিক হারটা নিঃসন্দেহে ভিন্নতর। তাই হয়তো বাংলাদেশে বাক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এসেছে বিভিন্ন সময়ে, এমনকি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক নেতার অগণতান্ত্রিক কালো হাত ধরেও।

মানুষ কি বলবে, কেন বলবে, সেটা ব্যক্তি নির্ভর। তার রুচি, তার বুদ্ধি, তার প্রজ্ঞা এর নিয়ন্ত্রক । তবে এর মূল্যায়ন ও সার্বিক বিচারের ভার কিন্তু জনগণের । পলিন হেনসেন জেলের দরজা ঘুরে আবার তার সেই পূর্ব নির্ধারিত আস্তাকুড়েতেই ফিরে গেছে।